The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 17, No. 33-34, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098, e-ISSN 2408-851X
DOI : http://dx.doi.org/10.70438/dujl/173334/0011

ভাষা পরিকল্পনা ও মুহম্মদ আবদুল হাই

নিজামউদ্দিন জামি*

Abstract: *Panini was the father of language planning. Language policy is recognised as 'language planning'. Scholars of the world's representative languages came together to play a groundbreaking role in revealing the nuances and relationships of various languages. The International Phonetic Alphabet (IPA) is a parameter in this case. Scholars of the world's representative languages created this history at the first international conference held in Hawaii, America in 1964. After that, language planning began in various ways in Bangladesh and abroad. Bengali linguists were no exception. Phonetician Muhammad Abdul Hai presented promising formulas and opinions on various aspects of Bengali language planning. Due to his mysterious death, many plans did not see the light of day. Muhammad Abdul Hai was recognised as a modern linguist in the country and also abroad. He unraveled the mysteries of the Bengali language in the style of Panini. Rabindranath Tagore introduced the descriptive trend in the discussion of the Bengali language. Muhammad Abdul Hai followed the trend of the two great scholars. The language plan he had for the Bangla department of Dhaka University is still worth following for the Bengali-speaking region.The present article discusses Muhammad Abdul Hai's contribution in this regard.*

Keywords: Phonetics, Language planning, Descriptive linguistics, Bangla language, Language movement, Dictionary

১. ভূমিকা

মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯) আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের অন্যতম। তাঁর বোধ ও কর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ঘটেছে। এর একদিকে আছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, অন্যদিকে আছে আন্তর্জাতিকতাবাদ। তিনি প্রধানত ভাষাবিজ্ঞানী। এ বিষয়ে তাঁর শ্রম ও সাধনা দীর্ঘ ও গভীর। ১৯৪৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯৫০ সালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে এমএ ক্লাসে ভর্তি হন। খ্যাতিমান

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি

ভাষাবিজ্ঞানী জে আর ফার্থের অধীনে A Study of Nasals and Nasalisation in Bengali শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করেন এবং ডিস্টিংশন নিয়ে এমএ পাশ করেন। এটি তাঁর দ্বিতীয় মাস্টার্স ডিগ্রি। উল্লেখ্য, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪২ সালে বাংলায় এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৩ সালের জানুয়ারিতে লন্ডন থেকে ফিরে তিনি পুনরায় বিভাগে যোগদান করেন। এর দুবছর পর (১৯৫৪) তিনি বাংলা বিভাগের রিডার ও অধ্যক্ষ পদে আসীন হন। সেই থেকে আমৃত্যু (১৯৬৯) তিনি বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা করেন। ১৯৬২ সালে অধ্যাপক পদে আসীন হন। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করতে গিয়ে তিনি বাংলা বিভাগকে ঢেলে সাজান। পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূরীকরণ, যুগোপযোগী পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন, যোগ্যশিক্ষক নিয়োগ, সাহিত্য পত্রিকা (১৯৫৭) প্রকাশ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে গবেষণার ধারা প্রবর্তন, বিভাগীয় সেমিনার প্রতিষ্ঠা, ধ্রুপদী সাহিত্য পুনর্মুদ্রণ, 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ-১৩৭০' আয়োজন প্রভৃতি উদ্যোগ ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে। তিনি কেবল জ্ঞানসাধকই ছিলেন না, একজন কর্মবীরও ছিলেন। মুহম্মদ আবদুল হাই-এর প্রধান কর্ম অধীত বিদ্যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব চর্চায় তিনি যে সফলতা অর্জন করেছেন, তা সংস্কৃত ভাষাচর্চায় কেবল পাণিনির সাথেই তুলনা করা যায়। মুহম্মদ আবদুল হাই বর্ণনাত্মক ধারায় ভাষাচর্চা করেছেন। বাংলা ভাষাচর্চায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বসূরী ছিলেন। দেশপ্রেম ও নাগরিক দায়বোধ থেকে তিনি বাংলা ভাষাচর্চার পাশাপাশি সাহিত্য-সংস্কৃতি সাধনায়ও উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁর উদ্যোগ ও কর্মের মূলে আছে দেশপ্রেম ও ভাষাবোধ। স্বজাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকে তিনি এ কর্মযজ্ঞ করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি আদর্শ ভাষারীতি তথা ভাষাপরিকল্পনা বিষয়ে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর উদ্যোগ ও প্রস্তাবসমূহ বাংলা ভাষাচর্চায় এখনো গুরুত্বের সাথে বিবেচিত ও অনুসৃত হয়।

২. আধুনিক ভাষা পরিকল্পনার ইতিহাস

ভাষার সাথে তুলনা করা হয় নদীকে, নদী প্রকৃতির খেয়াল-খুশি মতো ছুটে চলে। মানুষের কল্যাণ চিন্তা করে এখন পৃথিবীতে নদী শাসনও চলছে, পাওয়া যাচ্ছে আশানুরূপ সফলতাও। গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ভাষাশাসনও করছে। ভাষাতাত্ত্বিকরা তার নামায়ণ করেছেন ভাষারীতি বা ভাষাপরিকল্পনা (Language Planning). ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রথম উচ্চারণ করেন ইউরিয়েল ভাইনরাইখ, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরের বছর (১৯৫৮) American Anthropological Association এর সভায় এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইনার হগেন (১৯০৬-১৯৯৪)। এরপর থেকে তা সর্বজনীন বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। তাই পরিকল্পিত পরিবর্তন ব্যতীত ভাষার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

অপরিকল্পিত পরিবর্তনও ভাষায় ঘটে, যা ভাষা-বিশৃঙ্খলার প্রধান কারণ। বিভাগোত্তর বাংলাদেশেও এর দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন কেউ কেউ। ভাষা পরিবর্তিত হয় প্রধানত তিন পর্যায়ে– ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পর্যায়ে। যা কার্যকর হয় প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ এবং ভাষাবিদদের নিরলস সাধনা দ্বারা। অজ্ঞাতসারেও ভাষা পরিবর্তন করেছে সরকার। তবে ভাষাপরিকল্পনা বলতে মানুষের প্রয়োজন অনুসারে সচেতন পরিবর্তনকেই বোঝানো হয়। মনসুর মুসা সচেতন পরিবর্তনের বিভিন্ন উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন– পূর্ব বাংলা> পূর্ব পাকিস্তান> বাংলাদেশ। সিলোন> শ্রীলঙ্কা। রোডেশিয়া> জিম্বাবুই। সায়গন> হো চে মিন। পিকিং> বেইজিং। বার্মা> মায়ানমার। Dacca> Dhaka-এ সবই সুস্থির পরিবর্তন, আর এ সুস্থির পরিবর্তন যখন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও কৌশলগত দাবি পূরণ করে, তখন ভাষাপরিকল্পনা হিসেবে তা মান্য হয়। হালসময়ে বাংলাদেশের ৫ জেলার ইংরেজি বানান পরিবর্তিত হয়েছে। Chittagong> Chattogram, Comilla> Cumilla, Barisal> Barishal, Jessore> Jashore, Bogra> Bogura (প্রথম আলো, ২ এপ্রিল ২০১৮) এছাড়া কোথায় নতুন ভাষা চালু করতে হবে, কোথায় পুরনো ভাষা পুনরুজ্জীবিত করতে হবে, আবার দেখা গেলো দুটি ভাষাকে কোথাও কোথাও একই মর্যাদা দিতে হচ্ছে, এসব ক্ষেত্রে বিবেচিত ও বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণই ভাষাপরিকল্পনার পূর্বশর্ত। সমাজভাষাতত্ত্বের প্রধান শাখা ভাষাপরিকল্পনা। মুহম্মদ আবদুল হাই মনে করেন, 'ভাষা সমাজবিজ্ঞানেরই এক বৃহত্তম অংশ। ভাষার বৈজ্ঞানিক পঠনপাঠন ব্যতিরেকে সমাজবিজ্ঞানের যথার্থ তথ্যোদ্ধার সম্ভব নয়।' (হাই: ১৯৯৪: ৭) তৃতীয় বিশ্বের ভাষা-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা থেকে এর উৎপত্তি ও বিকাশ। আধুনিক ভাষাতত্ত্বের জটিলতা দূরীকরণে ভাষাপরিকল্পনার গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত।

২.১ ভাষা পরিকল্পনার সংজ্ঞা

আইনার হগেন বলেন, 'কোনো অসমরূপসম্পন্ন ভাষা-সম্প্রদায়ের লেখক ও বক্তার (কথক) পথনির্দেশনার জন্য আদর্শ লিখনরীতি বা লিপিরীতি, ব্যাকরণ ও অভিধান তৈরির যে-সব কাজ সেগুলোকে ভাষা-পরিকল্পনা বলা যায়।' (হগেন: ১৯৫৯: ৮) হগেন ১৯৬৬ সালে এসে তাঁর মত পরিবর্তন করে Standardisation বা ভাষার মান্যায়নকে ভাষাপরিকল্পনা বলে আখ্যা দেন। ফিশম্যান মনে করেন, 'ভাষা-পরিকল্পনা কথাটি দিয়ে "রীতিমত জাতীয় পর্যায়ে ভাষা-সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়াসকে" বোঝানো যেতে পারে।' (ফিশম্যান: ১৯৭৩: ২৩-২৪) মনসুর মুসা ফিশম্যানের সংজ্ঞার সাথে কিঞ্চিত দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁর মতে 'ভাষা-সম্প্রদায়ের ভাষিক-আনুগত্য রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন ও রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের অনুরূপ নাও হতে পারে।' (মুসা: ১৯৯৬: ২) রুবিন এবং ইয়ার্নুড বলেন, 'ভাষা-পরিকল্পনা হচ্ছে সুচিন্তিত ভাষা পরিবর্তন; অর্থাৎ ভাষার সংহিতা কিংবা বাচনিক সংশ্রয়ে কিংবা উভয়ে পরিবর্তন আনায়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের দ্বারা

প্রস্তাবিত পরিবর্তন।' (রুবিন ও ইয়ার্নুডঃ ১৯৭১ঃ XV1) তাঁরা প্রতিষ্ঠানের উপর অধিক নির্ভরশীলতার কথা বলেছেন। তাতে ব্যক্তি কিংবা সরকারের প্রভাব ততটা নেই। আবার কেউ কেউ বলেন, ভাষাপরিকল্পনা হচ্ছে ভাষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিস্তারিত খতিয়ান। এই সিদ্ধান্ত ব্যক্তি পর্যায় থেকে রাষ্ট্র পর্যায়ে ব্যাপ্ত হতে পারে। এবং তা (সুসিদ্ধান্ত) ফলপ্রসূ হতে পারে। (মুসাঃ ১৯৯৫ঃ ৩) হুমায়ুন আজাদ মনে করেন, 'ভাষার মানরূপ বিধিবদ্ধ করাই ভাষা-পরিকল্পনা।' (আজাদঃ ২০২১ঃ ৩৪২)

বোঝা গেলো, ভাষাপরিকল্পনা একটি ব্যক্তিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় একই সাথে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সুচিন্তিত এবং বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা। যোগাযোগ এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে সহায়তার জন্য এর উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সমাজ কিংবা রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে ভাষাও পরিবর্তিত হয়। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্যেও ভাষাপরিকল্পনা হয়। ফলে ভাষাপরিকল্পনা একটি সর্বসম্মত ও প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। যে ভাষা দেশের মানুষের কাছে সহজবোধ্য, ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান এমনকি রাষ্ট্রও তাকে সহজে গ্রহণ করে নেয়। ভাষাপরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো সহজীকরণ। যা পরীক্ষিত এবং সত্যায়িত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভাষাপরিকল্পনায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়; যা বৃহত্তর ভাষাগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা ও সমর্থন পায়। মহৎ পরিকল্পনা ও গভীর উপলব্ধি ছাড়া ভাষাপরিকল্পনার চিন্তা অমূলক। একটি দেশের বাজেট ঘোষণা থেকে শুরু করে জীবনে যাবতীয় কর্মকাণ্ড পারিচালিত হয় পরিকল্পনার ভেতর দিয়ে। নববর্ষের হালখাতা কিংবা মানুষের জীবনের নানা পরিকল্পনা, নানাপ্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি প্রণয়ন সবই সুস্থ ধারারই লক্ষণ। তাই সেদিক থেকেও ভাষার সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক নিবিড়। তেমনি পরিকল্পনা ব্যতীত ভাষা ব্যবহারও কদর্য হয়ে পড়ে। সুতরাং এর গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে আজকের দুনিয়ায় সফল হওয়া সম্ভব নয়।

২.২ ভাষা পরিকল্পনার আদিগুরু

ভাষাপরিকল্পনার একটা চমৎকার অতীত আছে। সম্প্রতি শাখাটিকে অত্যাধুনিক জ্ঞানশাস্ত্র বলা হলেও এর সূত্রপাত হয় প্রাচীনকালে (মুসাঃ ১৯৯৬ঃ ৪)। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'ই মানবজাতির প্রথম ভাষাপরিকল্পনা হিসেবে স্বীকৃত। এ পরিকল্পনাই সংস্কৃত ভাষাকে দেশে-বিদেশে এতো জনপ্রিয় এবং গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে। পাণিনি ১৪টি মাহেশ্বর সূত্রানুসারে 'অষ্টাধ্যায়ী' রচনা করেন। চার হাজারের অধিক সূত্র এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। মানবজাতির ভাষা গবেষণার সূত্রাবিষ্কারে এটি বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। গবেষকরাও তাই মনে করেন, 'পাণিনি তাঁর সমকালীন যুগের ভাষাকে বিধিবদ্ধ করার জন্য যে সব ভাষিক কৃৎকৌশল অবলম্বন করেছেন, সেগুলোর বহু কিছুই এখন ভাষা-পরিকল্পনার বিষয় হিসেবে স্বীকার্য।' (মুসাঃ ১৯৯৬ঃ ৪) হুমায়ুন আজাদ মনে করেন

ভাষাপরিকল্পনার সূত্রপাত হয় আরো আগে। 'অসচেতন ও সচেতন ভাষা-পরিকল্পনা চ'লে আসছে সম্ভবত তিন সহস্রাব্দ ধ'রে,-গ্রীক ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষা-পরিকল্পনা বেশ প্রাচীন ব্যাপার।' (আজাদ: ২০০১: ৩৪১) ভাষা যখন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের হীনস্বার্থে ব্যবহৃত হয়, ভাষা তখন তার নিজস্বতা হারায়, ভাষার গতিশীলতা নষ্ট হয়। সমাজের সমূহ ক্ষতিও ডেকে আনে ভাষার যেনতেন ব্যবহার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের গোয়েবল্সীয় প্রচারযন্ত্র এর নিকৃষ্ট উদাহরণ। শুধু তাই নয়, 'মৃতভাষা'ও সৃষ্টি হয়েছে রক্ষণশীল ও স্বার্থেন্বেষী মহলের নানা বিধিনিষেধ থেকে। মনসুর মুসা বলেন–

> সংস্কৃত ভাষাকে দেবভাষা আখ্যায়িত করে তাকে পবিত্র ঘোষণা করা হয়েছিল। ফলে পবিত্রতা ভঙ্গের অজুহাতে তার ব্যবহার সীমিত হয়ে যায়। এ সীমায়নের ফলে সংস্কৃতচর্চা ব্যাপক জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। ব্যাপক জনগণ প্রকৃত ভাষা-ব্যবহারে ব্যাবহৃত থাকে। (মুসা: ১৯৯৫: ৬)

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন, অনুশীলনের জন্য ১৮৭২ সালেজন বিম্স্ একটি একাডেমি স্থাপনের প্রস্তাব করেন। এর ২১ বছর পর ১৮৯৩ সালে 'দি বেংগলি একাডেমি অফ লিটারেচার' নামে তা প্রতিষ্ঠা পায়। পরে 'বঙ্গীয় সাহিত্য তা পরিষৎ' নামে তা প্রসিদ্ধি লাভ করে। বিম্সের সেই প্রস্তাবখানা (বক্তব্য) পরবর্তীতে (১২৭৯) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (১২৭৯) পত্রিকায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ' নামে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হলে বিদ্বৎসমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সেখানে ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইতালীয় এবং স্পেনীয় ভাষার সংস্কার পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি নানা তথ্য উপস্থাপন করেন। বাংলা ভাষার অসীম সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন–

> 'ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশ অপেক্ষা বিদ্যানুশীলন ও সভ্যতা বর্দ্ধনে বাঙ্গালা প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অগ্রগামী হওয়াতে, ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশের সাহিত্যাপেক্ষা বঙ্গীয় সাহিত্য উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, ইউরোপীয় সাহিত্য সদৃশ হইতেছে।' (জন বীম্স্: ২০০১: ৩৪৪)

সংস্কৃত ভাষার (শব্দের) আধিপত্য টিকিয়ে রাখার চেষ্টা বাংলা ভাষার স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করবে, এ কথা জন বিম্স্ও বুঝেছিলেন, তিনি বাংলাকে সাধারণের বোধাতীত করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেন,

> বাঙ্গালা ভাষা প্রণালীবদ্ধ করা যে আবশ্যক, তাহা বোধহয় সকলেই স্বীকার করিবেন। বাঙ্গালাকে একেবারে সংস্কৃত ভাষা করিয়া তোলা এবং সংস্কৃত আভিধানিক শব্দ সমূহ প্রয়োগ-পূর্ব্বক ভাষাকে সাধারণের বোধাতীত করা কখনও উচিত নহে। (জন বীম্স্: ২০০১: ৩৪৯)

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে জন বিম্স্ তাঁর রচিত 'বাঙ্গালা ব্যাকরণে' কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলেন। তন্মধ্যে আছে সংস্কৃত শব্দের পুনর্জাগরণ সম্পর্কিত তদবির, অপরটি হচ্ছে

'সাহিত্যিক ভাষা' জনগণের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠার আতঙ্ক। তিনি বাংলা ভাষার 'অথোরিটেটিভ স্ট্যান্ডার্ড' এর জন্য পণ্ডিতদের ঐকমত্য চেয়েছেন এবং এ বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। এর সমর্থনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯৯৪) রচনা করেন বিখ্যাত প্রবন্ধ 'বাঙ্গালা ভাষা' (১২৮৫)। ভাষা-শৃঙ্খলা বিধানে প্রবন্ধটি সর্বমহলের সমাদৃত হয়। তিনি অগ্রজ চিন্তকদের প্রচেষ্টাকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করেছেন। টেকচাঁদ ঠাকুরের (১৮১৪-১৮৮৩) 'আলালের ঘরের দুলাল'ই সংস্কৃতান্ধ পণ্ডিতদের বিষবৃক্ষের মূলে প্রথম কুঠারাঘাত করেছে বলে মনে করেন বঙ্কিমচন্দ্র। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি (টেকচাঁদ ঠাকুর) সেই ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।' (চট্টোপাধ্যায়: ২০১৮: ২৫২)

বিশশতকের শুরুতে ভাষাপরিকল্পনার সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায় প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)র রচনায় এবং তাঁর সম্পাদিত 'সবুজপত্রে' (১৯১৪)। 'চলতি বাঙলা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা প্রমথ চৌধুরী।' (আজাদঃ ২০০১: ৩৪২) 'প্রমথ চৌধুরী বিশশতকের দ্বিতীয় দশক থেকে চলিত রীতিতে প্রবন্ধ এবং ১৯১৪ সালে 'সবুজপত্র' প্রকাশ করে চলিত রীতিকে জনপ্রিয় করে তোলেন।' (ইসলাম, শেখরঃ ২০১৮: ১৯) এ প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের সমর্থন আদায় করেছিল। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ আরো একধাপ এগিয়ে ছিলেন, 'প্রমথ চৌধুরীর কাছে যা 'চলিত ভাষা' রবীন্দ্রনাথের কাছে তা 'চলতি ভাষা'–প্রমথ চৌধুরী সাধুত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নন, রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি মুক্ত।' (আজাদঃ ২০০১: ৩৪২) 'রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে সাধু ও চলিত উভয় রীতিই ব্যবহার করেছেন। তবে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' পত্রিকায় লেখার সময় থেকে তিনি চলিত রীতির গদ্যকে তাঁর গদ্য-সাহিত্যের বাহন করেন।' (ইসলাম ও শেখরঃ ২০১৮: ১৯) এর চূড়ান্ত পরিণতি দেখা যায় ১৯৫২ সালে বাঙালি জাতির মহান ভাষা আন্দোলনে। মনসুর মুসা বলেন–

> প্রকৃতপক্ষে বাঙলাভাষী সম্প্রদায়ে দীর্ঘদিন ধ'রে যে অবয়ব-পরিকল্পনা ও অবস্থান-পরিকল্পনার গরমিল চ'লে আসছিলো তার চরম বিকাশ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে। বাঙলা ভাষার অবস্থান-পরিকল্পনার দীর্ঘ অনিশ্চিত পথযাত্রায় ইতিহাসে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন। এই দিনেই নির্ধারিত হয় বাঙালি জীবনে বাঙলা ভাষার অবস্থান হবে প্রথম এবং অদ্বিতীয়। (মুসাঃ ১৯৯৫: ১১৪)

এছাড়াও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী [১৮৫৩-১৯৩১], বীরেশ্বর সেন [১৮৯৭-১৯৭৪], রাজশেখর বসু [১৮৮০-১৯৬০] প্রমুখ চিন্তকের উত্তরাধিকার লাভ করেন মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯)।

৩. মুহম্মদ আবদুল হাই-এর ভাষা পরিকল্পনা

ভাষাপরিকল্পনা নিয়ে বিশ্বের ভাষাবিদদের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার হাওয়াই নগরীতে। বাংলা ভাষার প্রতিনিধি হিসেবে এতে উপস্থিত ছিলেন ধ্বনিবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯)। Can Languge Be Planned? বা ভাষা কি পরিকল্পনা করা যায়? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তাঁরা একত্র হয়েছিলেন। যোয়ান রুবিন, চার্লস্ ফার্গুসন, ফিশম্যানসহ বিশ্ববিখ্যাত বহু ভাষাবিজ্ঞানী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। মূল প্রস্তাবনার ওপর একটি স্মারকগ্রন্থও প্রকাশিত হয়। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের একটি প্রবন্ধ এতে স্থান পায়। এ ধরনের অনুষ্ঠানে বাংলাভাষী কোনো ভাষাবিদ যোগদানের প্রথম সুযোগ পান। মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা ভাষাপরিকল্পনার প্রধান কারিগরদের একজন। তিনি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বাংলা ভাষাপরিকল্পনা করেন। 'ভাষাপরিকল্পনা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে মুহম্মদ আবদুল হাইও ছিলেন মূল তাত্ত্বিকদের একজন।' (সরকার: ২০১৯: ৭) ১৯৬৯ সালের এপ্রিলে (৭-১০) আমেরিকার হাওয়াই নগরে অনুষ্ঠিত ভাষাপরিকল্পনা বিষয়ক সেমিনারে মোট দশজন অংশগ্রহণকারী ছিলেন। তৎকালীন সমগ্র পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ধ্বনিবিদ মুহম্মদ আবদুল হাই।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর বেশ কয়েক বছর পর মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা বানানের সম্পূরক আরো ১৫টি নতুন ধারা লিখে সংস্কার কমিটির কাছে পাঠিয়েছিলেন। যে কারণেই হোক প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়নি। নতুন বানান রীতি মেনে চলার অঙ্গীকার করেছিলেন সকলে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অন্যতম সদস্য হয়েও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-রীতি মেনে চলতেন না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও তাই করতেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম, তিনি তাঁর কথা রেখেছিলেন। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বানান-সংস্কার কমিটি (১৯৩৬) গঠিত হয়। পরে ভাষাতত্ত্ববিদ ও গণিতজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীদেব প্রসাদ ঘোষ (১৮৯৮-১৯৮৫) বানান কমিটির নানা সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখেছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মুহম্মদ আবদুল হাই এ কমিটিকে অতিরিক্ত আরো ১৫টি প্রস্তাবনা পাঠিয়েছিলেন। হাই ও ঘোষের পর্যবেক্ষণ প্রায় কাছাকাছি ছিল।

ভাষাপরিকল্পনা বিষয়ে মুহম্মদ আবদুল হাই-এর প্রবল আগ্রহ লক্ষ করা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগকে কেন্দ্র করে তিনি সেই স্বপ্নের বীজ বপন করেছিলেন। ভাষাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে তিনি বাংলা বিভাগ থেকে নিয়মিত *সাহিত্য পত্রিকা* (১৯৫৭-১৯৬৯) প্রকাশ করতেন। 'তিনি যখন *সাহিত্য পত্রিকা* প্রকাশের উদ্যোগ নেন তখন বাংলা ও বাঙালির সত্যি দুর্দিন চলছিল। পরাধীন জাতির কপালে যত দুর্গতি থাকে, বাঙালির তাই ছিল।' (জামি: ২০২২: ১৭) মুহম্মদ মজির উদ্দীন বিষয়টি আরো গভীরে গিয়ে অনুধাবন করেন। 'পাকিস্তান আমলে প্রাচীন বাংলা বিষয়ে রচনা করলে

সরকারের বিরাগভাজন হবার আশঙ্কা ছিল। বিষয়ের জটিলতা ছেড়ে দিলেও কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হবার ঝুঁকি নেবার লোক ছিল বিরল। পোশাকী ভাষাপ্রেমিকরা এদিকে পা মাড়াতেন না– অধ্যক্ষ আবদুল হাই এক যুগ ধরে *সাহিত্য পত্রিকার* মাধ্যমে বাংলা ভাষার সেবা করেছিলেন একান্ত অকুতোভয়ে।' (উদ্দীন: ২০০০: ৩১১) প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৬৪ বঙ্গাব্দের (১৯৫৭) আষাঢ় মাসে। তাঁর এ উদ্যোগ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও লাভ করেছিল। পরবর্তী বাংলাদেশে *সাহিত্য পত্রিকা* অনুকরণীয় হয়েছে, অনুস্মরণীয় হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু নয়, বাংলা একাডেমি পর্যন্ত তাঁর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিলো। একাডেমির নানা কাজের সাথে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন, নীতি নির্ধারণেও রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ভাষাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাংলা একাডেমির বাঙলা বানান সংস্কার উপ-সংঘের তিনিও সদস্য ছিলেন। সংঘের অন্যান্য সদস্যরা হলেন– মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, কাজী মোতাহার হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, মুহম্মদ ওসমান গণি, মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ফেরদৌস খান ও আবুল হাসনাৎ। যদিও সংঘের অধিকাংশ সভ্যই তা অনুসরণ করতেন না।

ভাষাচর্চায় অভিধানের গুরুত্ব অপরিসীম। মুহম্মদ আবদুল হাই অভিন্ন রীতিতে অভিধান প্রণয়ন জরুরি বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি নিজেও বাংলা অভিধান প্রণয়নের চিন্তা করেছিলেন; যদিও তাঁর পরিকল্পনা শেষ করার সময় তিনি পাননি। নানা ষড়যন্ত্রের মুখে তাঁর রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে। তবে তিনি পথ দেখিয়ে গেছেন ব্রতী, জ্ঞানপিপাসুদের। ড. হরেন্দ্রচন্দ্র পালের অভিধান সংক্রান্ত গ্রন্থটিও তাঁর হাতেই প্রকাশিত হয়। এ কাজে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের আন্তরিকতা নিয়ে আজহারউদ্দীন খান্ বলেন–

> ড. হরেন্দ্রচন্দ্র পালের শিক্ষাদীক্ষা পূর্ববঙ্গে হলেও অদৃষ্টচক্রে তিনি বহুদিন পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। রাজনৈতিক দূরত্ব হাই সাহেবকে বেঁধে রাখতে পারেনি, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ড. হরেন্দ্রচন্দ্র পালের "বাংলা সাহিত্যের আরবী ফারসী শব্দ" সংকলন গ্রন্থটি প্রধানত তাঁরই অনুরোধে ও উৎসাহে সম্পূর্ণ হয়। 'সাহিত্য পত্রিকা'য় সেটি তিনি ধারাবাহিক প্রকাশ করেন। (শীত ১৩৬৮–শীত ১৩৭২) এবং তাঁরই উদ্যোগে ভূমিকাসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৯৬৭)। (খান: ১৯৯৯: ৩১০-১১)

গ্রন্থটি ছাপানো পর মুহম্মদ আবদুল হাই ড. হরেন্দ্রচন্দ্র পাল*কে অভিনন্দন জানিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অভিধান আকারে তা প্রকাশ করার পরামর্শ দেন। রচনাটি *সাহিত্য পত্রিকায়* প্রকাশের জন্যে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের কাছে পাঠিয়েছেন

** হরেন্দ্রচন্দ্র পাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্সি ও উর্দু বিভাগের প্রথম হিন্দু ছাত্র। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ময়ময়সিংহ জেলায়। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফার্সি ও উর্দু বিভাগ থেকে ফারসিতে বিএ অনার্স, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে এমএ পাশ করেন।১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ইরানি শাখা বিষয়ে এবং ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ও উর্দু বিষয়ে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গ্রন্থের মধ্যে আছে 'উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস', 'পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস', 'বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসি শব্দ','The Nauruz in the Shahnama','Umar Khyyam and his Nauruznama' প্রভৃতি।*

ভাষাবিদ ড. সুকুমার সেন (১৯০১-১৯৯২)। মুহম্মদ আবদুল হাই বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন। তাতে তিনি আশা প্রকাশ করেন–

> অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত A New English Dictionary (NED) ধরনের আমাদের দেশে যদি কোনো দিন বাংলা শব্দাবলীর কিংবা বাংলায় ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দের অভিধান প্রণীত হয় সেদিন ডক্টর পালের রচিত প্রস্তুত গ্রন্থটি আদর্শ হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং ভবিষ্যৎ গবেষকগণ তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হবেন। (হাই: ১৯৯৪: ৪৮৫)

জ্ঞানের নতুন শাখা বা বিষয়কে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্যে 'পরিভাষা' অপরিহার্য। বাংলা ভাষা নিয়ে যেহেতু মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের মহাপরিকল্পনা ছিলো, এর অংশ হিসেবে তিনি পরিভাষাও প্রণয়ন করেন। 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' (১৯৬০) গ্রন্থে তিনি প্রায় আটশত শব্দের আধুনিক পরিভাষা তৈরি করেছেন। ছোট হলেও তার আবেদন অনস্বীকার্য।

মুহম্মদ আবদুল হাই '৫২-র ভাষা আন্দোলনে সরাসরি অংশ নিতে না পারলেও আন্দোলনের সাথে যুক্ত সতীর্থদের সাথে তিনি মনেপ্রাণে মিশে গিয়েছিলেন। এ সময় ভাষাতত্ত্বে উচ্চতর গবেষণা করতে তিনি লন্ডন ছিলেন। এর আগে যেমন তিনি মাতৃভাষার পক্ষে কথা বলেছেন, তেমনি পরেও পালন করেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলাকে চালু করার জন্যে তিনি নানা উদ্যোগে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। 'দেশে থাকলে ঐ বিভাগের ছাত্রবান্ধব শিক্ষক হওয়ার সুবাদে মুনীর চৌধুরীর মতো তিনিও গ্রেফতার হতে পারতেন বা চাকরি খোয়াতে পারতেন। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকিয়ে এমন মন্তব্য খুব সহজে করা যায়।' (সরকার: ২০২১: ৮)

বাংলা বিভাগের উদ্যোগে 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ-১৩৭০'র আয়োজনটি ছিলো বাংলাভাষী অঞ্চলের জন্য অদ্বিতীয় ও ঐতিহাসিক ঘটনা। সামরিক সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে উদ্বোধনী সভায় নিঃশঙ্ক চিত্তে মুহম্মদ আবদুল হাই বলেছিলেন–

> শুধু সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর দায়িত্ব না চাপিয়ে নিজেরা যেখানে দৈনন্দিন জীবনে বাংলার ব্যবহার করতে পারি– যেমন, নিজেদের মধ্যে কিংবা সভা-সমিতিতে আলাপ-আলোচনায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় এবং হল ইউনিয়নগুলোর মধ্যে নিমন্ত্রণ-পত্রে, বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে লেখা চিঠিপত্রে এবং ভাবের আদান-প্রদানে, বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্রে, দোকানপাটের নামপত্রে, গাড়ীর নম্বর-ফলকে–সেখানে কেন যে বাংলা ব্যবহার করি না আমি তাই ভেবে আশ্চর্য হই। এখানে তো কেউ বাধা দেবার নেই। (হাই: ১৯৬৩: ৪)

এটিও তাঁর ভাষাপরিকল্পনার অংশ ছিল, সন্দেহ নেই। মনিরুজ্জামান বলেন, 'না, হাই সাহেব ভুল করেননি; তিনি 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' করে হাজার বছরের বাংলা ভাষার ঐতিহ্যকে তুলে ধরলেন এবং নিজের অবস্থানকেও বুঝিয়ে দিলেন।' (মনিরুজ্জামান: ২০০০: ১৮৯) স্বরোচিষ সরকার এর গুরুত্ব অনুধাবন করে বলেন, 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহে সপ্তাহব্যাপী যেসব প্রবন্ধ পঠিত হয়েছিল, ভাষা, লিপি সাহিত্য ও

সংস্কৃতির যেসব প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল সবগুলোর মধ্যেই নিহিত ছিল মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ভাষা-পরিকল্পনা।' (সরকার: ২০২১: ১০)

সাহিত্যের ভাষা নিয়েও মুহম্মদ আবদুল হাই ভেবেছেন। এলাকার সাহিত্যে সে অঞ্চলের মানুষের প্রতিচ্ছবি-জীবনধারা, ধর্ম-সংস্কৃতি, আলো-আকাশ, নদী-পাহাড়ের ছায়া পড়বে বৈকি! এতে দোষের কিছু দেখেন না মুহম্মদ আবদুল হাই। লেখকের জন্য তো বটেই, এমনকি পাঠকেরও তা জন্মগত অধিকার। তাঁর ভাষাপরিকল্পনার চিন্তাসমূহের মধ্যে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে।

'আমাদের সাহিত্যের ভাষা' প্রবন্ধে মুহম্মদ আবদুল হাই আত্মজিজ্ঞাসার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'সাহিত্যের ভাষা কি হবে এ প্রশ্ন তোলার আগে দেখতে হবে সাহিত্যিক যে জীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলতে চাচ্ছেন তার সঙ্গে তার গভীর পরিচয় আছে কি না?' (হাই: ১৯৯৪: ১৭) প্রমিত উচ্চারণ বিষয়ে মুহম্মদ আবদুল হাই প্রায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। তাঁর রচনার সর্বত্রই উচ্চারণের বিষয়টি কোনো না কোনোভাবে উঠে এসেছে। এ বিষয়ে তাঁর কয়েকটি রচনা পাওয়া যায়। 'আমাদের বাংলা উচ্চারণ' (১৩৬৫), 'ধ্বনির ব্যবহার' (১৯৫৮), 'ভাষা ও ব্যক্তিত্ব' (১৩৬৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' এবং 'প্রাথমিক বাংলা ব্যাকরণ' গ্রন্থসমূহে উচ্চারণের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন তিনি। 'ধ্বনির ব্যবহার' প্রবন্ধে তিনি উচ্চারণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কথা বলেন–

> নিজের উচ্চারণকে ভালো করার জন্যে, কথা বলে অপরের কাছে নিজেকে সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলার জন্যে ভালো করে কথা বলার শক্তি আয়ত্ত করা চাই। অবশ্য ভালোভাবে কথা বলতে পারার মধ্যে মানুষের ব্যক্তিত্বের বহু কিছুই জড়িয়ে আছে, তবু মানুষের মুখের মিষ্টি উচ্চারণ যে মানুষকে সুন্দরভাবে ফুটে উঠার সুযোগ দেয়, তা স্বীকার না করে পারি কই? (হাই: ১৯৯৪: ২৯১)

'আমাদের বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধে তিনি আরো বলেন–

> পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের অঞ্চলিক উচ্চারণ ব্যবহার করুন তাতে কারও কোন আপত্তি থাকার কারণ নেই কিন্তু সমগ্র শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন হিসাবে Received Pronunciation-এর মতো একটা কিছু গ্রহণ না করলে এমন দিন আসবে যেদিন পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করার মধ্যে যে ভাষার সবচেয়ে বড়ো উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা দেখো দেবে। (হাই: ২০১৮: ২৯০)

মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের উচ্চারণ রীতি পরবর্তী সময়ে প্রবলভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য তিনি ছোট্ট একটি ব্যাকরণ রচনা করেন, নাম 'মাতৃভাষা

শিক্ষা' (১৯৬৬)। এর ভূমিকায় তিনি লিখেন, 'ইংরেজী essay শব্দের প্রতিশব্দ না ধরিয়া composition শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে 'রচনা' শব্দটির ব্যবহার করিলে দেখা যায় মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য রচনা ও ব্যাকরণ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।' (হাই: ১৯৬৬: নিবেদন)

১৯৪৮ সালে আরবি হরফে বাংলা লেখার পক্ষে পাকিস্তান সরকারের সাথে কণ্ঠ মেলান কতিপয় বাঙালি। কিন্তু বিশেষজ্ঞ কমিটি তা বিশ বছর পিছিয়ে দেয়ার জন্যে মত দেন। ইতোমধ্যে বিষয়টি আরো জোরালো হয়ে ওঠে। আরবি ও উর্দু দুটি প্রস্তাবই নাকচ করে দেন আমাদের বুদ্ধিজীবী-পণ্ডিতরা। মুহম্মদ আবদুল হাইও এ আন্দোলনের সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। আরবি এবং উর্দুকরণের আন্দোলন ব্যর্থ হলে সরকার এবার 'রোমান হরফে বাংলা' লেখার প্রস্তাব নিয়ে আসে। এর স্বপক্ষে নয়টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন তারা। মুহম্মদ আবদুল হাই সবকটি প্রস্তাব ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেন। 'রোমান বনাম বাংলা হরফ' প্রবন্ধের শেষে গিয়ে তিনি এর সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন,

> বাংলায় রোমান লিপির প্রচলন যতটুকু না সুবিধা সৃষ্টি করবে তার চেয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করবে অনেকগুণে বেশী। সুতরাং রোমান লিপির প্রচলন করে সমগ্র জাতি যে অসুবিধায় পড়বে তার তুলনায় বর্তমান বাংলা লিপির সামান্য দোষ-ত্রুটির কিছু সংস্কার করে নেওয়া বহুগুণে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। (হাই: ১৯৯৪: ৭১)

মুহম্মদ আবদুল হাই নানা পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার উন্নয়নে ব্রতী হয়েছিলেন। বাংলা লিপি সংস্কার ও বানান সমস্যা সমাধানের জন্যে তিনি তাঁর 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' গ্রন্থে সুচিন্তিত প্রস্তাব পেশ করেছেন। যার বৈশিষ্ট্য ছিল বিজ্ঞানসম্মত এবং অজটিল। কিছু কিছু বানান অসহনীয় মনে হলেও বুৎপত্তি ও ধ্বনি বিচারে তা অবৈজ্ঞানিক ছিল না। লিপি এবং বানান সংস্কার ভাষাবিজ্ঞানীর কাজ, সাহিত্যিকের নয়।* কারণ ভাষার মধ্যে নিহিত রয়েছে একটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক গাঁথুনী। আমাদের দেশে বিজ্ঞানভিত্তিক ভাষাপরিকল্পনার দিক উন্মোচিত হয় মূলত তাঁরই হাতে। ধ্বনির শৃঙ্খলা বিধানে তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য বিদ্যার সম্মিলন ঘটান, তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন, শুধু ভাষা-সংস্কার করে নয়; কখনো কখনো এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েও মাতৃভাষার সেবা করা সম্ভব।

প্রথম দিকে মুহম্মদ আবদুল হাই লিপি সংস্কারের কথা বললেও ১৯৬৬ সালে 'ভাষা-সংস্কার কমিটি' যখন এ বিষয়ে মতামত চান তখন তিনি এর বিপক্ষে অবস্থান নেন। তাঁর সাথে আরো ছিলেন মুহম্মদ এনামুল হক এবং মুনীর চৌধুরী। তাঁরা যে প্রতিবেদন দাখিল করেন তা নিম্নরূপ:

** এক্ষেত্রে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি একাধারে ভাষাবিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক ছিলেন।*

> আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই সামগ্রিকভাবে প্রস্তাবগুলি হইতে ভিন্নমত পোষণ করিতে হইল। অধিকন্তু, আমরা মনে করি যে, বাংলা লিপি ও বানান সরলায়ন ও সংস্কারের কোন আশু প্রয়োজন নাই। এইরূপ কাজে হাত দিলে নিশ্চিতরূপে ভ্রান্তি বিভ্রান্তিতে পরিণত হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষার দ্রুত উন্নয়ন বিশেষভাবে ব্যাহত হইবে। (হাই: ১৯৯৯: ৩১৩)

কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এ সংস্কার প্রক্রিয়ার মধ্যে সরকারের দুরভিসন্ধি আছে। সরকারের উদ্দেশ্য ছিলো বাংলা ভাষাকে শিকড়হীন করা। তাই তাঁরা এ উদ্দেশ্যমূলক সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। এ সংস্কার প্রস্তাব ছিলো সরকারের, পণ্ডিতদের চিন্তাপ্রসূত নয়। এটাকেও মুহম্মদ আবদুল হাই সাহস, বুদ্ধিমত্তা এবং দূরদর্শিতা দিয়ে আটকে দিয়েছিলেন।এ সবই তাঁর ভাষাপরিকল্পনার একেকটি দিক। 'মুহম্মদ আবদুল হাই ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নির্ণয় করার জন্য ভাষা সম্প্রদায় অভিধাটি উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করেছেন।' (আসাদুজ্জামান: ২০২২: ৩৬)

৪. উপসংহার

বাংলা ভাষাপরিকল্পনায় যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁদের অন্যতম। রহস্যজনক মৃত্যুর পর 'প্রথম দিনের সূর্য' বলে তাঁর সহকর্মীরা যে অভিধা দিয়েছিলেন, মুহম্মদ আবদুল হাই প্রকৃতপক্ষে প্রথম দিনের সূর্য ছিলেন। ভাষার উন্নতির ওপরই একটি জাতির উন্নতি নির্ভর করে। একটি জাতিকে স্বাধীন সার্বভৌমত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তার ভাষা, সংস্কৃতি স্বাধীন ও গতিশীল হতে হয়। এরূপ নানা পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা ভাষা ও বাঙালির মনন ও চেতনাকে উর্বর করেছিলেন। আধুনিক যুগে ভাষাপরিকল্পনা উন্নততর কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত। এর যতগুলি ধাপ আছে, তিনি তার সবকটির রূপরেখা (framework) উপস্থাপন করেছেন এবং প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলেছেন। এ লক্ষ্যে তিনি জাতিকে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন।

তথ্যনির্দেশ

আজাদ, হুমায়ুন (২০০১), বাংলা ভাষা [দ্বিতীয় খণ্ড] হুমায়ুন আজাদ সম্পা. ভূমিকা। ঢাকা আগামী প্রকাশনী।

আসাদুজ্জামান, মুহাম্মদ (২০২২), ভাষা ও সংস্কৃতি অন্বেষণে মুহম্মদ আবদুল হাই। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা।*

বর্ষ ১৪ : সংখ্যা: ২৭-২৮ (যুক্ত), ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলাম, রফিকুল ও শেখর সৌমিত্র (২০১৮). বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। ঢাকা, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

উদ্দীন, মুহম্মদ মজির (২০০০), বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ: প্রেক্ষিত সাহিত্য পত্রিকা। স্মারকগ্রন্থ (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পা.)। ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।

খান্, আজহারউদ্দীন (১৯৯৯), ভোরের আকাশ শুকতারা, দীপ্ত আলোর বন্যা। ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র (২০১৮), বাঙ্গালা ভাষা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য (রফিকুল ইসলাম ও সৌমিত্র শেখর সম্পা.), ঢাকা, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

জামি, নিজামউদ্দিন (২০১৯), মুহম্মদ আবদুর হাই ও সাহিত্য পত্রিকা। বাংলা একাডেমি পত্রিকা। ৬৩ বর্ষ: ৩য়-৪র্থ সংখ্যা। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

বীম্‌স্‌, জন, বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ। বাঙলা ভাষা [দ্বিতীয় খণ্ড], (হুমায়ুন আজাদ সম্পা.), ঢাকা আগামী প্রকাশনী।

মনিরুজ্জামান (২০০০), অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই: তাঁকে শ্রদ্ধা। স্মারকগ্রন্থ (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পা.)। ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।

মুসা, মনসুর (১৯৯৬), ভাষা পরিকল্পনার সমাজভাষাতত্ত্ব। ঢাকা, বাংলা একাডেমী (পুনঃমুদ্রণ)।

(১৯৯৫), বাংলা ভাষা: ইতিহাস ও সমস্যা। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হাই, মুহম্মদ আবদুল (১৯৯৪), রচনাবলী [তৃতীয় খণ্ড] (হুমায়ুন আজাদ সম্পা.)। ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

(১৯৯৪), রচনাবলী [দ্বিতীয় খণ্ড] (হুমায়ুন আজাদ সম্পা.)। ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

(১৯৬৩), ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০ (সম্পা.)। ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(১৯৬৬), নিবেদন, মাতৃভাষা শিক্ষা, ঢাকা, গ্রীন বুক হাউস।

(২০১৮), আমাদের বাংলা উচ্চারণ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। ঢাকা, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

সরকার, স্বরোচিষ (২০১৯), মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ভাষাপরিকল্পনা। বাংলা একাডেমি পত্রিকা। ৬৩ বর্ষ: ৩য়-৪র্থ সংখ্যা। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

Fishman, J. A. (1973). Language Modernization and Planning in comparison with other types of National Modernization and Planning. In *Advances in Language Planning.* The Hague & Paris:Mouton. pp. 79-102

Haugen, Einar (1959). Planning for a Standard Languge in Modern Norway. *Anthropological Linguistice,*1: 3 8-21.

Rubin, J & Jernudd B. H (1971). *Can Languge Be Planned?*Hawaii : The University Press of Hawaii.